BDeBooks.com

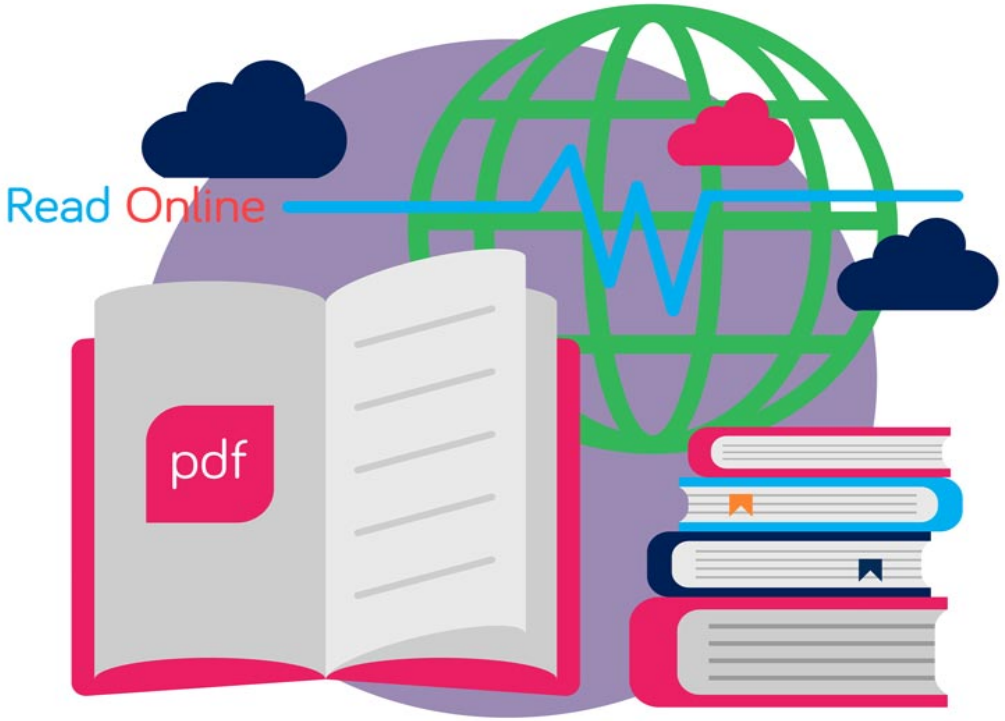

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

নিজে বুঝে নিন

আশাপূর্ণা দেবী

রাত নাগাদ বারোটা।

ভুরসুট পরগনার প্রতাপপুরের বড়কর্তা জগদীশপ্রতাপ তাঁর কলকাতার বাড়ির তিনতলায় নিজের শোবার ঘরে একা একা বসে জোর আলো জ্বালিয়ে দুখানা মোটা খাতা সামনে বিছিয়ে হিসেবপত্র দেখছিলেন। যদিও জমিদারির বারোটা বেজে গ্যাছে কবেই। এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না; তবু 'বড়কর্তা' নামটির মায়া ছাড়তে পারেননি জগদীশপ্রতাপ। এখনো প্রতাপপুরের কেউ 'বড়কর্তা' না বললে মনে মনে যথেষ্ট চটেন।

চটবার কারণও বিদ্যমান আছে বৈকি! ওই 'প্রতাপপুর' তো তাঁরই ঠাকুর্দার বাবু নৃসিংহপ্রতাপের খাশ 'পত্তন'। তাঁর নামেই প্রতাপপুর। তিনি নাকি দাবি করতেন তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যর জ্ঞাতিগুষ্টির।

তা জাকগে। কে কী না দাবি করছে।

তবে বোলবোলাও একখানা ছিল বৈকি। জগদীশপ্রতাপের বাবার আমলেও ছিল কিছু কিঞ্চিৎ।

জগদীশ অবশ্য তাঁর বাপের ঠাকুর্দা মহামান্য নৃসিংহপ্রতাপকে জ্ঞানে তেমন ভালো করে দেখেননি। আবছা মনে পড়ে, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি খুব ভোরবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছেন।

মন্তর পড়ছেন গমগমে গলায়।

এছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

যা কিছু শোনা বাবার কাছে।

শুনতে পেয়েছেন সেই নৃসিংহপ্রতাপের জন্মদিনটি আর তাঁর মৃত্যুদিনটি এক।

নৃসিংহপ্রতাপের সেদিন সত্তর বছরের জন্মতিথি।

সকালবেলা ঠাকুর মন্দিরের ভোগ পুজো সব দেওয়া হয়ে গ্যাছে। নৃসিংহপ্রতাপ তিলবাটা মাথায় ঘষে দীঘিতে চান করে এসেছেন এবং এসে খিড়কির পুকুরে একটি জীওলমাছ ছেড়ে দিয়ে নিজের দীর্ঘায়ু নিজেই কামনা করে পুজোপাঠ করেছেন।

দুপরে যখন রুপোর থালা-বাসনে সত্তর প্রকার ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্লাস বৃহৎ একটি রুই মাছের মুড়ো আর বড় জামবাটির একবাটি পরমান্ন নিয়ে যুঁই ফুলের মতো ফুরফুরে চামরমণি চালের ভাতটির সামনে খেতে বসেছেন আর গালচের আসনের ধারেকাছে মস্ত একটা পিলসুজের ওপর প্রকাণ্ড একখানা পেতলের প্রদীপ পেটভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি নিয়ে দপদপ করে জ্বলছে।

আগের আমলে এটাই ছিল জন্মদিনের শুভকাজের অঙ্গ। কেক কাটাকাটির তো চলন ছিল না। আর বয়স গুনে জ্বেলে দেওয়া মোমবাতির সারি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ারও পাট ছিল না। সেকালে লোকে বাতি নিভে

যাওয়াটাই অলক্ষণ কুলক্ষণ মনে করতো। তাই প্রদীপে পেটভর্তি তেল, মোটা করে সলতে।

আর খানদানি বাড়িতে প্রদীপের পেট ভরানো হত তেলের বদলে ঘিয়ে। আর প্রথম অন্নটি মুখে দেওয়া মাত্তর ভোঁ ভোঁ করে তিনবার শাখে ফুঁ দেওয়া।

তা সে পর্ব মিটেছে।

তোয়াজ করে খেয়ে চলেছেন নৃসিংহ। সত্তরটি পদ, সুযোগমতো একবারও অন্তত মুখে ঠেকাতে হবে। তো ঠ্যাকাতে ঠ্যাকাতে যখন চাটনিতে এসে ঠেকেছেন, তখন আবার তিনবার ভোঁ ভোঁ শঙ্খধ্বনি।

কী হোল? আবার শাঁখ?

জিগ্যেসে করতে না করতেই, ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার শব্দ। সদ্যোজাত শিশুর গগনবিদারী পরিত্রাহি শব্দ।

ওটা আবার কী? কাঁদে কে?

বুড়ি পিসি কাছে বসে পাখা নাড়ছিল। বলল,—ঘরে নতুন মানুষ এলো। তোর ব্যাটার ঘরে নাতি জন্মালো।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? তার মানে নৃসিংহপ্রতাপের প্রপৌত্র এলো। তো আসবার কথা ছিল বুঝি?

—কথা ছিল বৈকি। তো দু-দশদিন বাদে আসার কথা। আচমকা আজই তোর জন্মদিনে হানকান করে ভূমিষ্ঠ হয়ে বসলো।

নৃসিংহ ক্ষীরের বাটিতে গোঁফ ডুবিয়ে মুচকে হেসে বললেন,—হুঁ। ব্যাটা খুব ধড়িবাজ হবে মনে হচ্ছে। ওরে কে আছিস। এই প্রদীপটায় আরো ঘি ঢেলে দিয়ে যা।

শুধু ঘি না, একেবারে খাঁটি গব্যঘৃত।

তো সেই প্রদীপ ঘি খেয়ে খেয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। ছ-দিন ছ-রাত। ষেটেরা পুজোর পরদিন সকালে তার ছুটি। রাতে বিধাতা-পুরুষ কপালে লেখন দিয়ে যাবার কাজ অবধি।

বিধাতা-পুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে। তবে সেই জগদীশের কাছে খাঁটি গব্যঘৃত এখন স্বপ্নের বস্তু।

সাবেকী মানটির ঠাটবাট রেখে চলেছেন এখনো। ভাতের পাতে ঘি, দুধ, দই, চাটনি, পাতিলেবু কম্পালসারি।

গাওয়া ঘি বলে দেশ থেকে ঘি আনান বেশী দাম দিয়ে। তো সেই খাঁটি ঘিয়ের আড়াই বাঘ বনস্পতি। আর বাকি দেড়ভাগ ভঁয়সা।

তাহলে কী হবে। দেশের ঘি বলে ওতেই আত্মপ্রসাদ জগদীশপ্রতাপের।

প্রতাপ'এর বালাই নেই কোথাও, তবু প্রতাপপুরের অহঙ্কার।

ওই যে নৃসিংহপ্রতাপের সঙ্গে জন্মদিনের মিল তাই তাঁর সঙ্গে যেন কেমন একাত্ম অনুভব করেন। আবার বাপের মুখে শুনেছেন চেহারাতেও নাকি মিল।

হলেও অবস্থান্তর, মনেপ্রাণে জগদীশ প্রতাপপুরের বড়কর্তা। চালচলনে তদুপযুক্ত ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই যে রাত দুপুরে খাতাপত্তর নিয়ে হিসেবে বসেছেন, তো টেবিল-চেয়ারের বালাই আছে নাকি? শোবার ঘরের মস্ত পালঙ্কটাকেই 'কাছারি ঘরের ফরাস' মনে করে তার মাঝখানে জোড়াসনে বসে সামনে খুলে রাখা জাবদা খাতা দুটো থেকে কীসব মেলামিলি করছেন।

আগে আগে ভারী কাঁচের দোয়াতদানি সামনে বসিয়ে কলমে কালি ডুবিয়ে লিখতেন। ছেলে বলে বলে ফাউন্টেন পেন ধরিয়েছিল। সম্প্রতি আবার 'আরো সুবিধে' দেখিয়ে নাতি ডটপেন ধরিয়েছে।

তা দেখছেন ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ সুবিধের। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধে বাড়ছে বৈকি! তবে অসুবিধেও যে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, একথা জগদীশপ্রতাপ জোর গলায় ঘোষণা না করে ছাড়েন না।

এখন আর ছেলে তর্কে নামে না। তর্কটা নাতির সঙ্গে চলে। পাল্লাটা কোনদিকে ভারী, ডটপেনের না খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের—এ তর্কের মীমাংসা হয় না।

রোজই হিসেব চলে।

টেবিলে খাওয়া আরামের না মাটিতে বসে খাওয়ার। প্যান্ট, পায়জামা সুবিধের, না লম্বা কোঁচা ধুতির।

নাতির প্রশ্নে দাদুর জবাব,—পেন্টুল পাজামা তো একালে জমিদারেও পরে, জমাদারেও পরে। কিন্তু লম্বা কোঁচা? কই দেখা দিকি কোনো জমাদারের?

টেবিলে খাওয়া? যেন অফিস কাছারিতে কাজ করতে বসা। মাটিতে আসন পেতে ছড়িয়ে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা। হিসেব করে দ্যাখ।

তা সে যাক।

এখন জগদীশ যে হিসেব নিয়ে বসেছেন, সেটি বেশ জটিল।

প্রতাপপুরের 'বাবুদের বাড়িটি' মানে নৃসিংহপ্রতাপের বানানো সেই প্রাসাদটির এখন এমন জরাজীর্ণ অবস্থা ঘটেছে যে, মেরামতি করে একটু ভদ্রস্থ করতে হলেও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। আসবে কোথা থেকে সে টাকা? আর সারিয়ে তুলেই বা কী হবে? কে বাস করতে যাবে সেই ভরসুট পরগনার প্রতাপপুরে?

ছেলের মতে বেচে দাও। বরং ঘরে কিছু আসবে। মরা হাতি লাখ টাকা, ওই ভাঙা বাড়িরও এখন অনেক দাম পাওয়া যাবে।

ভিটে আবার বেচব কি?

বলে প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিলেন জগদীশপ্রতাপ। ক্রমশ যুক্তিতর্কে নিমরাজী! কিন্তু মুশকিল এই—নয় নয় করেও সেখানে এখনো অনেক আসবাবপত্তর। যাওয়াও হয় সেখানে। অন্তত জগদীশ তো যান।

সবাই যে 'বড়কর্তা' বলে ছুটে আসে, এ গৌরব কি দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল পাহাড়ে গেলে হবে?

তা সেসব যখন চুকেবুকে যাচ্ছে জিনিসগুলো কী হবে? ছেলে আর বৌমা বলল—এখানে কাজে লাগার মতো যা কিছু আছে নিয়ে আসুন। বাকি বিলিয়ে দিয়ে আসুন।

কিন্তু এখানে কাজে লাগবার মতো অনেক কিছুই তো একে একে আনা হয়েছে। আর কী আনা হবে? ঘরে ঘরে যে বৃহৎ বৃহৎ পালঙ্ক বসানো আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকগুলো আছে এখানে সেখানে, বৈঠকখানা বাড়িতে যে ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে সেগুলো বিলোতে চাইলেই বা নেবে কে? কার ঘরে এত জায়গা আছে?

তাছাড়া আর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে যেটা নিয়েই এখন সমস্যা আর হিসেবনিকেশ। জগদীশের ঠাকুমা একটা বড়লোকের গিন্নির দেমাকে আবদার করেছিলেন, তাঁর 'লক্ষ্মীর ঘরটি'র অর্থাৎ পুজোর ঘরটির পুরো মেজেটা টাকা গেঁথে গেঁথে বাঁধিয়ে দিতে হবে। যেমন সব কাশী-বৃন্দাবনের মন্দিরে দেখে এসেছেন। যে কথা সেই কাজ।

আনানো হলো বস্তাভর্তি চকচকে আসলি চাঁদির টাকা। কোনোটায় মহারানীর মুখ, কোনোটায় তাঁর ন্যাড়ামাথা ছেলের মুখ। তা সেটি গুছিয়ে সাজিয়ে গাঁথতে মিস্ত্রিরাই পারবে। ডাকা হলো হিন্দু রাজমিস্ত্রি মুকুন্দকে। ঠাকুর ঘর বলে কথা! চিরকেলে রাজমিস্ত্রি রসিদ আর আবদুল হেসে হেসে বলল,—বাড়িখানা কিন্তু আমরাই বানিয়েছিলুম মা-ঠাকরুন। আপনার ওই লক্ষ্মীর ঘরটিও।

তা হোক, এখন ঘরে উঁচু তাকে লক্ষ্মীর পট। নতুন ধানের হাঁড়ি। সেসব থাকবে। শুধু মেজেটা খোঁড়াখুঁড়ি। তারপর টাকা গেঁথে গেঁথে মেজে বানিয়ে ফেলা।

এখন জগদীশ মহাফাঁপরে পড়েছেন ওই ঘরটার হিসেব নিয়ে। ক-হাত বাই ক-হাত ঘর। তার মেজেটা জুড়ে যে টাকা পোঁতা হয়েছে সে কত টাকা।

পুরনো তস্য পুরনো সব খাতাপত্তর থেকে মজুর মিস্ত্রিদের দৈনিক 'রোজ'-এর হিসেব।

মুকুন্দর রোজ ছ'আনা, তার মজুরের রোজ দু-আনা। কিন্তু ক'দিন লাগল আর কতগুলো টাকা পুঁতল তার হিসেব পাচ্ছেন না কোথাও। তাই রাত জেগে সেই আদ্যিকালের খেরো বাঁধান খাতা নিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজছেন।

ছেলে বলল,—অত হিসেবের কী আছে? যখন খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগবে, তখন কেউ পাহারা দিতে উপস্থিত থাকবে। যত যা ওঠে।

তবে সত্যি টাকার এখন অনেক দাম। ষোলো আনার টাকা এখন অনেক অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু কে বসে পাহারা দেবে?

ছেলে বলে,—আপনার ঠাকুমার আবদারকেও বলিহারি যাই বাবা। ঘরের মেজেয় টাকা গেঁথে বাহার করে দিতে হবে। তিনি টাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটা চলা করবেন। অথচ টাকা না কি মা-লক্ষ্মী, পা ঠেকে গেলে নমস্কার করতে হয়।

ছেলের বৌ বলল,—সেকালে জমিদার-গিন্নিদের অহঙ্কারই ছিল আলাদা। সত্যি টাকা মাড়ানো উচিত?

জগদীশ বললেন,—এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, দেবমন্দিরে তো থাকে, এ

তো ওঁর পুজোর ঘর, লক্ষ্মীর মন্দির।

এখন পরের জেনারেশান বুঝুক ঠ্যালা।

বাড়ি বেচে দেব চুকে যাবে। তা নয় তার মেজে খোঁড়াও, টাকা ওপড়াও। তো গুনে দেখেছেন কখনো কত টাকা গাঁথা আছে?

ওরে বাবা! কে আবার কবে গুনে দেখতে গ্যাছে।

কিন্তু এখন ভাবছেন জগদীশ, গোনা থাকলে ল্যাঠা মিটে যেতো। খোঁড়াখুঁড়ির মিস্ত্রিকে কড়া করে বলে দেওয়া যেতো, দ্যাখো বাপু, এই আছে, একটুও যেন এদিক ওদিক না হয়।

সে শাসানির উপায় নেই।

তবু এই সত্তর বছরের জগদীশ এই রাত বারোটায়, বাড়ির সবাই যখন ঘুমে কাদা, আর রাস্তা নিঃঝুম, তখন পালঙ্কের ওপর বাবু গেড়ে বসে সামনে খেরোর খাতা খুলে সেকালের নায়েব গোমস্তাদের 'অনিন্দনীয়' ছাঁদের হাতের লেখা সব হিসেবপত্তর তন্ন তন্ন করে দেখছেন, যদি কোথাও লেখা থাকে কত টাকা পোঁতা হয়েছিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। আর চোখ যেন সেখানেই ফ্রীজ হয়ে গেল।

'কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে আনয়ন করা হইল দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা ও. . . সের গিনি।'

কত সের? বোঝবার উপায় নেই। ঠিক সেইখানটাই পোকায় খেয়েছে।

দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা।. . . এত সের গিনি।'

হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে গেল জগদীশপ্রতাপের। কর্তারা সব যা ইচ্ছে করে গ্যাছেন। আর পরের জেনারেশনের ভাগ্যে শুধু ডুগডুগি।

টাকার হিসেব, গিনির হিসেব সংখ্যা নিয়ে নয়, মণ সের দিয়ে। সাপের পা দেখেছিলেন সব?

টাকা থাকলেই এই ভাবে নয় ছয় করতে হবে?

রাগের চোটে জগদীশপ্রতাপের মনে পড়ল, না চিরকালের পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল তাই হয়ে আসছে। টাকা থাকলেই নয় ছয়। শুধু 'নয়-ছয়ের' রীতি-পদ্ধতিটাই স্থান কাল পাত্রের হিসেবে আলাদা হয়।

নবাব বাদশারা তাদের জুতোয় হীরে মুক্তো সেঁটে বাহার করতেন। খানদানি বাবুরা পোষা বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। আর বড় মানুষের গিন্নিরা শখ হলে তাঁর দাঁড়ের ময়না পাখি, টিয়া পাখির দাঁড়টাকে সোনা দিয়ে গড়িয়ে নিতেন।

তা শুধু সে যুগে কেন, এ যুগেও কি টাকা নয় ছয়ের কোনো হিসেব আছে? হুঁ। এ যুগে অতো সোনারুপোর বাহার না দিক, শখের খাতিরে লাখ লাখ টাকা আকাশেই উড়িয়ে দেয়, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কে ভাবতে যাচ্ছে দেশের কত লোক খেতে পাচ্ছে না।

রাগটা একটু প্রশমিত হলে জগদীশপ্রতাপ ভাবলেন, তা তো হলো। রুপোর টাকা ঠাকুর ঘরের মেজেয় আর দেওয়ালের খানিকটা পর্যন্ত যে গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা তো চাক্ষুষই দেখেছি। তবে টাকাগুলোর ওজন যে দেড় মণ তা কে ভাবতে গ্যাছে?

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় জগদীশ আর তাঁর পিঠোপিঠি দিদি ঠাকুরঘরে গেলেই গুনতে বসতেন, কতগুলো টাকা মহারানী মার্কা, কতগুলো ন্যাড়ামাথা রাজা মার্কা।

কিন্তু গিনি?

গিনি তো কোথাও সাঁটা থাকতে দেখেননি।

অথচ খাতায় পষ্ট করে গিনির হিসেব লেখা রয়েছে। গিনি. . .সের। লক্ষ্মীছাড়া কাগুজে পোকারা কেটে খাবার আর জায়গা পায়নি। ওই 'কত' সের তার সংখ্যাটি হাপিস করে দিয়েছে।

তা দিক, ছিল তো কিছু। দশ সের পাঁচ সের এক সের আধ সের যা হোক। কিন্তু কোথায় তারা?

মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে খাতাটা আরো তন্ন তন্ন করে দেখছেন, হঠাৎ যেন সামনে একটা ছায়া পড়ল।

কে?

চমকে উঠলেন জগদীশ।

—কে? কে? কেরে ব্যাটা?

ব্যাপারটা কী? যতই রোগা সিড়েঙ্গে আর তোবড়ানো চেহারা হোক, রাত বারোটায় ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কীভাবে?

তবে কি আজ জগদীশ দরজায় খিল লাগাতে ভুলে গেছলেন? কিন্তু এমন ভুল তো হয় না জগদীশের।

গিন্নি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার পর থেকে তো একাই

থাকতে হয়। কাজেই বেশ জম্পেশ করেই সব বন্ধ করে তবে শোন।

ওঃ। দৈবাৎ একদিন হয়তো ভুলে গেছেন, আর অমনি ব্যাটা চোর এসে সেঁধিয়েছে? কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকে?

যাক, সাবধানতার ঘাটতি নেই জগদীশের। কারণ এই ঘরেই লোহার সিন্দুক।

এখন সংসারের সব গয়নাপত্তর আর দরকারী কাগজপত্র ভল্টে রেখে আসার ফ্যাসান হয়েছে। জগদীশ এ ফ্যাসানের গাড্ডায় পড়তে রাজি নন। ছেলে বৌ যত বলে বলুক।

চোখের সামনে না থাকলে জিনিসটা ক্রমেই ছায়া হয়ে যাবে না? একবার খুলে দেখবার ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন?

কেন মজবুত সিন্দুকের অভাব আছে বাজারে?

আর তোমার গিয়ে ব্যাঙ্কই বা কী নিরাপদ? রাতদিনই তো ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুঠ।

জগদীশের মাথার শিয়রে লোহার সিন্দুক, মাথার বালিশের তলায় রিভলবার।

এর থেকে বুকের বল আর কিসে?

কে? বলে উঠেই জগদীশ হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশের তলায় হাত চালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা বলে উঠল, উঁ-হু-হু, দোহাই বড়কত্তা, অমন কাজটা করবেন না। ওতে আপনার লোকসান বৈ লাভ হবে না।

বড়কর্তা!

তার মানে চেনা চোর।

অর্থাৎ প্রতাপপুরের জানিত।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—হুঁ। তা সত্যি তোর মতন একটা ছুঁচোকে মেরে গুলিটাই লোকসান। তো কে তুই?

আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না। বটে? তামাশা? তবে তো দেখছি মরণের কাল ঘনিয়ে এসেছে তোর। ইষ্টনাম স্মরণ কর ব্যাটা। এই চালালাম হাত বালিশের তলায়।

আজ্ঞে বড়কর্তামশাই, আমাদের মতো নিকৃষ্ট জনের আবার ইষ্টোনাম। আর বাঁচাই বা কী, মরাই বা কী!

—হুঁ। খুব কথা জানিস দেখছি। তো বড়কর্তা বললি কোন্ সুবাদে?

—শৈশবাবধি শুনে আসছি, ওই সুবাদে।

—বুঝেছি। প্রতাপপুরের 'মাল'। তো বাঘের ঘরে ঘোগ? বড়কর্তার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিস চুরি করতে?

—আ ছি ছি! অমন কথা বলবেন না কর্তা! আপনার ঘরে সেঁদুবো চুরির মতলবে?

—বটে? তা' মাঝরাত্তিরে দোরটা একটু খোলা পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে এসেছ কীসের মতলবে যাদু? কর্তার পা টিপে দিতে না পাকাচুল তুলে দিতে?

—হিসেবের খাতাটা পোকায় কেটেছে দেখে চিন্তে করছিলেন। তাই ভাবলুম. . . ।

জগদীশ সোজা হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠেন,—বলি, তুই লোকটা কে? নাম কী?

—আজ্ঞে জ্ঞানাবধি তো দেখে আসছি সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে।

—বটে, নাম জানো না? সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে সেটাই জানো। পাজি বদমাশ। একটা কথার সিধে জবাব দিতে জানো না? বলি প্রতাপপুরে তো মেলাই বৈকুণ্ঠ। টেকো বৈকুণ্ঠ, খোঁড়া বৈকুণ্ঠ, কুমীর-খাওয়া বৈকুণ্ঠ. . .।

—আজ্ঞে ওনারা তো সব সজ্জন। এ হতভাগা হচ্ছে মুকুন্দ মিস্ত্রির ব্যাটা, মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠ। এখন অবশ্য পাবলিকে বলে. . . ।

—অ্যাঁ, কী বললি?

স্প্রীঙের পুতুলের মতো ছিটকে খাড়া হয়ে বসলেন জগদীশ।

—চালাকি খেলতে আসার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা? রাগের মাথায় আপন খুড়োর মাথাটা থান ইঁটের ঘায়ে গুঁড়ো করার দায়ে তোর না ফাঁসি হয়েছে! আর তুই ব্যাটা. . . ।

লোকটা অকুতোভয়ে বলে,—আজ্ঞে ফাঁসি হয় নাই, একথা তো বলি নাই। সেই তরেই তো বলতে যাচ্ছিলুম, এখন পাবলিকে নামটা উচ্চারণ করতে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠ'। আমার ঘরখানাকে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠর বাড়ি।'

—ওঃ। তা ফাঁসির ফাঁস আলগা করে ফেলে

জেলখানা থেকে পালিয়েছিলি তাহলে? বদলে আর একটা নকল বৈকুণ্ঠ ফাঁসিতে ঝুলল?

আ, ছি ছি।—শিউরে উঠল লোকটা ঃ ওকথা বলবেন না কর্তা। প্রাণে বড় দাগা পাবো। তবে হ্যাঁ, ঘটছে এমন ঘটনা রাতদিনই। জেলখানার মধ্যে কতজনাই যে অপরের নামে 'প্রক্‌সি' দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে, পাথর ভাঙছে, তার সীমে-সংখ্যা নাই। আর ফাঁসি? তাও মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রক্‌সি চলে বৈকি! তা ওসব হলো গে পয়সাওলা লোকদের কারবার। হতোভাগা বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির বলে পান্তোর ওপর নুন জুটতো না। সে কিনতে যাবে ফাঁসি খাবার মানুষ! ছ্যা।

—থাম বদমাশ! কেবল প্যাঁচানো কথা।

জগদীশ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠে রিভলবারটা টেনে বের করে বাগিয়ে ধরে বললেন,—সিধে জবাব দে। বলি, ফাঁসিটা শেষতক হয়েছিল, না রদ হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে গরিবগুর্বোর কী আর শাস্তি রদ হয় বড়কর্তা? সেও বড় মানুষদের ঘটনা।

—ফের? বললাম না, সিধে জবাব দিবি। বলি, ফাঁসিটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হয়েছিল?

—ওই তো রাজমিস্ত্রি বৈকুণ্ঠের।

—তাহলে তুই কে?

—ওই তো বললুম, আজ্ঞে 'কেউ' বললে ওই বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রি! আবার 'কেউ না' বললেও চুকে যায়।

—আবার!

জোরে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলেন জগদীশপ্রতাপ। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। তার সঙ্গে জগদীশ-এর ছেলে অমিতপ্রতাপের উদ্বিগ্ন গলার স্বর,—বাবা, দরজাটা একটু খুলুন তো!

জগদীশ একটু হতচকিত হলেন। তাহলে তো ঘরের দরজা বন্ধই আছে। ভুলে খুলে রাখিনি। তবে? ওই পাজিটা অথবা পাগলটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাথায় খেলে গেল, তার মানে, ব্যাটা আগেই কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়ে খাটের নীচে-টিচে লুকিয়েছিল। জগদীশ যখন খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন

তখন তো আর দরজায় তালা লাগিয়ে যাননি। এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

তা এসব মুহূর্তের চিন্তা।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে দরজাটা সাবধানে খুলতে গেলেন, পাছে বৈকুণ্ঠবাবাজী ফস্ করে বেরিয়ে সটকান দেন।

কিন্তু এ আবার কী! কোন ফাঁকে ফট্ করে কোথায় গা-ঢাকা দিল?

কোথায় আর, সেই খাটের নীচেই। আচ্ছা থাকো বাবাজী। দ্যাখো তোমার কী হয়।

দরজাটা খুলেই নিজেই প্রশ্ন করলেন, —কী হল?

ছেলে বলল, —আমাদের আবার কী হবে। আপনার কী হল তাই জানতে এলাম। মনে হল হঠাৎ যেন কাউকে ধমকে উঠলেন।

জগদীশ মনে মনে হাসলেন। বাবুর কান মাঝরাতেও খাড়া।

—ও হ্যাঁ। তা দিয়েছিলাম বটে।

—এত রাত্তিরে—বন্ধ ঘরের মধ্যে কাকে?

খাটের নীচের দিকে একটু অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একটু মজা করার গলায় বললেন,—'কাউকে' বললে কাউকে। আবার 'কাউকে নয়' বললে নয়।

ছেলের পিছু পিছু বৌমাও চলে এসেছে। দুজনে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে বলল,—মানে?

—মানে এক ব্যাটা ছুঁচো এসে জ্বালাচ্ছিল. . . .।

বৌমা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলল,—এই ওপরের ঘরে ছুঁচো!

—সেই তো. . . .।

ছেলে চমকে উঠে বলল,—বাবা, আপনার রিভলবারটা খাটের ওপর পড়ে কেন?

—ওই তো. . . .।

জগদীশ অম্লান গলায় বলেন,—ভেবেছিলাম, জ্বালাচ্ছে, নিকেশ করে দিই। তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করল না।

কী কাণ্ড! ঘরের মধ্যে ছুঁচো।

তো সেটাকে তো তাড়াতে হবে।

ছেলে ফটাফট ঘরের আর দুটো আলো জ্বেলে দিয়ে আলনায় ঝোলানো জগদীশের শৌখিন ছড়িটা নিয়ে খটাখট তাড়া লাগিয়ে ঘর তোলপাড় করে তুলল।

খাটের নীচেটায়?

তা দেখল বৈকি। টর্চ জ্বেলে হেঁট হয়ে।

ইত্যবসরে নাতিও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

—কী হয়েছে দাদু? এত রাত্তিরে সবাই হট্টগোল করছ কেন?

দাদু অপ্রতিভভাবে বলেন,—কিছু না দাদু, ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচো ঢুকে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতেই —কিন্তু কোন্ ফাঁকে সে হাপিস হয়ে গেল? অবশ্য ছুঁচো, 'চোর বললে চোর'।

—চোর? অ্যাঁ কই? কোথা দিয়ে পালাল?

জগদীশের চিন্তার সুর,—তাইতো ভাবছি।

—বাবা!

অমিতপ্রতাপ বলল,—আপনি রাত অবধি জেগে জেগে ওইসব পচা পচা ভুতুড়ে খাতাগুলো দেখতে বসবেন না। খাতাগুলো দেখলেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই বৌমা বলে উঠল,—আর রাতের খাওয়াটাও একটু হালকা হলে ভালো হয়। আপনাদের প্রতাপপুরের পাঠানো ক্ষীরের সঙ্গে খাজা কাঁঠাল পাকা আম আর তার সঙ্গে খাস্তা লুচি চটকে মেখে—ওঃ আমার তো দেখেই পেট ব্যথা করে। খাবার কথা ভাবতেই পারি না।

—হা-হা-হা।

জগদীশপ্রতাপ এই মাঝরাত্তিরেই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

—তা পারবে কোথা থেকে?—জন্মাবধি তো ভয়ে ভয়ে না খেয়ে খেয়ে নাড়ি মারা। আমার ঠাকুর্দা একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন, বুঝলে? একাসনে বসে এককুড়ি বড় সাইজের ল্যাংড়া আম। আর একটা ছাগলও একা সাবাড় করতে পারতেন। আমার ঠাকুমাটিও কম যেতেন না। বলতেন, আমের সময় আবার দু-বেলা ভাত খেয়ে মরি কেন?. . .তাই তাঁর রাতে ভাতের পাট থাকত না। দাসীরা কেউ একজন এক ঝুড়ি আম, এক গামলা জল

আর একখানা বঁটি নিয়ে বসতো। আর ঠাকুমা বসতেন একখানা খালি থালা আর এক কাঁসি ভর্তি মাছের ঝাল নিয়ে। একটির পর একটি আম ছাড়িয়ে পাতে দিয়ে চলেছে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন। গোণাগুণতির ধার ধারতেন না। তার সঙ্গে ওই সর্ষেলঙ্কায় গরগরে মাছের তেল-ঝালের টাকনা। নিজের গাছের আম, পুকুরের মাছ, গোণাগুণতি কীসের?

নমস্য মহিলা।

বৌমা বলল—তা না হলে আর অমন সব প্ল্যান মাথায় আসে? টাকা পুঁতে পুঁতে ঠাকুরঘরের মেজে বাঁধাবো। 'মোজাইক' কোথায় লাগে। এ একেবারে বাহারের চূড়ান্ত।

জগদীশ আবার হেসে উঠলেন।

—তা যা বলেছো বৌমা। এই তো হিসেবের খাতায় সেই টাকার ওজন দেখে চক্ষু চড়কগাছ।. . .কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা আনয়ন করা হইল।

—দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা! শুনে মাথা ঘুরছে বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বৌমা নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নাতিও। শোনা গেল, প্রশ্ন করছে,—'মণ' কী মামণি? অমিতপ্রতাপ বলল,—রিভলবারটা আমায় দিন তো।

—কেন? তুমি আবার কী করবে?

—থাক না আমার কাছে। আপনি ঘুমের ঘোরে কী করতে কী করে বসবেন, কী বলা যায়!

—হা-হা-হা। ভাবছিস বাবাটার মাথার গোলমাল হয়েছে। নারে বাবা, না। এখন পরমার্শ দে দিকি। বাড়িখানা হাতছাড়া করার আগে ওই দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা উপড়ে নেওয়া যাবে কীভাবে?

—কাল দিনের বেলা ভাবা যাবে বাবা। এখন শুয়ে পড়ুন।

আবার ফটাফট জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে, ছেলে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দরজার খিল ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে, ঘুরে এসে আবার খাটের ওপর বসতেই যেন খিক খিক করে একটা হাসির শব্দ পেলেন।

—কে? কে? অ্যাঁ!

—খুব বেপোটে পড়ে গেছলেন বড়কর্তা, কী বলেন? ছেলে বৌমা নাতি পর্যন্ত ছুঁচো খুঁজতে হাল্লাক।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—তোর রকম-সকম দেখে তো তোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না বাপু।

—আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন বিচোক্‌খোণ বেক্তি।

—ফাঁসি খেয়ে মরে অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি?

—আহা, বড় ভাল নামটি তো দিয়েছেন কর্তা। অপোদেব্‌তা। বাড়তি একটা 'অপো' থাকলেও দেব্‌তার দরে চলে এলুম তা'লে?

—হুঁ। তো হঠাৎ আমার এখানে এলেন কেন বাপু? মতলবটা কী?

জগদীশ রিভলবারটা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে খাতার বোঝা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বাবুগেড়ে গুছিয়ে বসে বললেন,—শুনি তোর মতলব!

—কোনো কুমতলোব নাই বড়কর্তা। সাত পুরুষে আপনাদের খেয়ে মানুষ। ওই যে আপনার ঠাকুরমার টাকা পোঁতা ঘর, ও ঘর তো আমারই বট্‌ঠাকুর্দা বানিয়েছিল।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? কে সে? নামটা কী?

—আজ্ঞে বাবার জ্যাঠা। নাম ছিল পাতকীচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মিস্ত্রিদের মধ্যে খুব নামডাক ছিল। দেবমন্দিরের কাজকম্মো তো অহিন্দু মিস্ত্রি দিয়ে চলতো না।

—বটে না কি? খুব যে ভাঁওতা দিচ্ছিস। ঘরবাড়ি মঠমন্দির পুজোর দালান এসব কারা বানায়? আমি তো বরাবর দেখছি রসিদ মিস্ত্রি আর তার ছেলে বাহার মিস্ত্রি. . .!

—বড়কর্তা, সে সব হলগে পুজোপাঠ আরম্ভ হবার আগে। আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোনো কাম পড়লেই ডাক পড়তো এই আমাদের।

—বুঝলুম। তা তোর বাবার জ্যাঠাকে তুই দেখেছিস?

—দেখেছি। একশোর কাছে বয়েস হয়েছিল। নামিয়ে বসিয়ে দিতে হতো। আমারে খুব ভালবাসতো। যতো গপ্পো আমার সঙ্গে।

—হুঁ। শৈশব থেকেই এঁচোড়ে পাকা! তো খাতায় হিসেব দেখছি, রুপোর টাকা, ওজন দেড় মণ। তা থেকে কতটি সরিয়েছিল তোর ঠাকুর্দা, সে গপ্পো কখনো করেছিল তোর কাছে?

সিড়িঙ্গে বৈকুণ্ঠ সড়াৎ করে একদম সোজা।

—ছি ছি। অমন পাপ কথা মুখে আনবেন না হুজুর। এ কী বৈঠকখানা ঘরের কাজ-কাম, যে তা থেকে কিছু মারবে? ঠাকুরঘর বলে কথা!

—ওঃ। ধর্মজ্ঞানী পুরুষ। তো বল দিকিনি গিনির হিসেবটা কী? সেও নিশ্চয় তোর বড় ঠাকুর্দা. . . ।

থামতে হল।

আবার দরজায় ধাক্কা।

—বাবা! দরজাটা একবার খুলুন তো।

জগদীশ গলা নামিয়ে বললেন,—আজ আর হল না। এখন যা। কাল আবার আসিস।

উঠে দরজা খুললেন জগদীশ।

—কী? আবার কী হল?

—কী হল সেটাই তো জানতে এসেছি।

ছেলের স্বর বেজায় বিরক্ত, উত্তেজিত।

—মনে হচ্ছে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি তখন থেকে।

জগদীশ আত্মস্থ।

বললেন,—কইছি তাই না কি?

—মাঝরাত্তিরে একা একা কথা বলবেন মানে? ঠিক আছে, আমি এ ঘরে শুই।

—মাথা খারাপ। তুই আবার কী করতে শুতে আসবি?

—তো আপনি যদি. . . .।

—আরে বাবা, কিছু না কিছু না। আমার মেজ মামা বলতো, রাত্তিরে যদি ঘুম না আসে তো খবরদার ঘুমের ওষুধ খেতে যাবি না। এক মনে ধারাপাতের পড়া 'কড়াকিয়া', 'গন্ডাকিয়া,' 'কাঠাকিয়া' আউড়ে যাবি। দেখবি ঘুম 'বাপ বাপ' করে আসতে পথ পাবে না! যা যা, শুতে যা। আর কথা-টথা শুনতে পাবি না।

ছেলেকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, কাল আবার আসতে বললাম। আসবে তো। এলে খুব ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু আচ্ছা, ভূত-টুত বলে তো মনে হচ্ছে না। কই, কথা বলতে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল না। ভয় ভয় ভাবও করছিল না। অথচ ঢোকা বেরোনোও তো টের পাওয়া গেল না। একা আমার বুড়ো চোখ নয়, আরো তিন জোড়া চোখ তল্লাশ করেছে ঘর।

আমাদের প্রতাপপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি গোষ্ঠ তেলির ঠাকুমা একটা বিদ্যে জানতো। ধুনোপড়া।

চোরেরা নাকি গোষ্ঠর ঠাকুমার কাছ থেকে ওই ধুনোপড়া শিখে নিয়ে চুরি করতে বেরোতো।

না এলে তো চুকেই যাবে। না এলে বোঝাই যাবে চোর জোচ্চোর। আর একে. . .।

●

ঘুমটা সবে এসেছে, কানের কাছে মাছির পাখা নাড়ার মতো ফিসফিস শনশন শব্দ।

বড়কর্তা, ঘুমোলেন না কি?

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন জগদীশপ্রতাপ।

নাইলনের মশারি। মশারির মধ্যে থেকেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি।

—একী। অ্যাঁ! আবার এক্ষুণি এলি যে? বলে দিলাম না কাল আসতে?

বললেন অবশ্য খুব চাপা গলায়।

—আমাদের আবার কালাকাল। কীবা রাত্র কীবা দিন। . . .ওই গিনিগুলোর হদিস জানতে বট্‌ঠাকুর্দার সন্ধানে ঘুরপাক খেলুম কে জানে কতক্ষণ! তারপর মনে হল 'কাল'কে এসে গেছে। কিন্তু এসে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বড়কর্তা।

—কেন, হঠাৎ মন খারাপ কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের বড় সন্দ বাতিক। এখনো ভাবতেছিলেন ব্যাটা বৈকুণ্ঠ ভূত না চোর।

—তা বটে। আমি কী ভাবছিলাম তা টের পেলি কী করে?

—সেই তো। ওই রোগেই তো সুখ-শান্তি গ্যাছে। না

বলতেই সব বুঝে ফেলি।

—দ্যাখ বাপু, ভূতে বিশ্বাস অবিশ্বাস সবটাই মনুষ্য-জন্মের একটা রোগ। তুই যখন বেঁচেছিলি, সহজে ভূত বিশ্বাস করতিস?

—বেঁচে ? হতভাগা বৈকুণ্ঠ আবার বেঁচেছিল কবে বড়কর্তা? মরেই তো থাকতো।

নাঃ সোজা করে কথা বলা ধাতেই নেই তোর। তা তোর বট্‌ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হল?

—হওয়া খুব কঠিনই হচ্ছিল। ওনারা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা। স্বর্গে ওনাদের পুণ্যির ওজন মাফিক সব মহল্লা। আমাদের মতন গলায়-দড়ি পাপী-তাপীদের সেখানে পৌঁছবার পাশপোর্টই নাই। তবে. . . ।

—থাম। থাম। ওই মহল্লাটা কী জিনিস?

—ও আজ্ঞে অন্য কিছু না, নামী নামী শহরের 'এস্‌টাইল'। কে কোন্ মহল্লায় ঠাঁই পেয়েছে জানতে পারলেই বোঝা যাবে কার কতটা পুণ্যি। এই যেমন আপনাদের রাজধানীতে—বাসার ঠিকানা শুনলেই বুঝতে পারা যায় কে রাজা, কে গজা। কে মন্ত্রী, কে যন্ত্রী। কে অফিসার, কে কেরানী। কে এলেমদার, কে জমাদার।

—বটে! রাজধানীর এত কথা জানিস তুই?

—আজ্ঞে এখোন তো আর রেলভাড়া লাগে না! সর্বত্র চষে বেড়াই আর দেখি।

—হুঁ, কিন্তু ঠাকুর্দার কাছে যেতে পাশপোর্ট লাগে কেন?

—সে আজ্ঞে ওখানকার আইন। বড় কড়া আইন। তবে কিনা পাহারাদারকে একটু ঘুষ টুস দিয়ে. . . ।

—অ্যাঁ। স্বর্গেও ঘুষ?

—আজ্ঞে কর্তা, ঘুষ আর কোথায় নাই?

খিক খিক একটু হাসির শব্দ।

—থাক। আমার আর জেনে কাজ নেই। ঠাকুর্দা কী বলল তাই বল্।

—বলল? বলল যে. . .।

ঘর অন্ধকার। জোর পাখার বাতাসে মশারি উড়ছে।

বৈকুণ্ঠকে এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার যাচ্ছে না।

—কী রে? কী হল? থেমে গেলি যে? চলে গেলি নাকি?

—আজ্ঞে চুপ চুপ। সিঁড়িতে যেন কার পদশব্দ শুনলুম। আবার না ছোটকর্তা দরজা ধাক্কায়।

—ধাক্কাক্। আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। ক্যানেস্ত্রা পিটোলেও ঘুম ভাঙবে না।

বলল, গিনি ছিল আজ্ঞে সাড়ে বারো সের। ঠাকুর্দার সাক্ষাতে ওজন হয়েছিল।

—সা-ড়ে বা-রো সের গিনি! বৈকুণ্ঠ, এখন তার কত দাম?

—জানা নাই বড়কর্তা। চিরদিনই আদার বেপারি জাহাজের খবর রাখি না।

—আমিই বলছি—অনে-ক দাম। হিসেব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে। ছেলেকে জিগ্যেস করতে হবে। এখন কী উপায়, তা বল্।

—আজ্ঞে কীসের উপায়?

—ওই সোনারুপো উদ্ধারের। . . . বৈকুণ্ঠ! চুপ করে গেলি যে! এই বৈকুণ্ঠ. . .

—আজ্ঞে ঠাকুর্দাকে শুধিয়ে এলাম।

—এক্ষুণি শুধিয়ে আসা হয়ে গেল?

—তা হল আজ্ঞে। মনোরথে চেপে যাওয়া-আসা। তো ঠাকুর্দা বলল, উদ্ধারের উপায় কম। মিস্ত্রি উপড়োতে গেলে চুরি করে সাফ করে দেবে।

—আরে বাবা, পাহারা থাকবে।

—যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে। আর চুরি না করে তো গরমেন্টের ঘরে খবরটা তুলে দেবে। ব্যস, পুলিশি জেরা চলবে। এত টাকা তোমার পূর্ব-পুরুষ পেল কোথায়? হিসেব দাও। না দিতে পারলে গারদে যাও।

—এই সেরেছে। তাহলে তো বড় বিপদ।

—আজ্ঞে আপনাকে আর আমি কী বলব? তবে ঠাকুর্দা বলতো, সম্পদই বিপদ। তো এখন ঠাকুর্দা বলল, বড়কর্তাকে বলগে, যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে। পুরাতন অট্টালিকাখানা দানই করুন আর বেচেই দিন যেন চটপট করেন।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—কেন রে বাপু? বড়কর্তার দিন ফুরিয়ে আসছে না কি?

—আহা। ইশ্ তা নয় আজ্ঞে। ওই অট্টালিকাখানারই দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোনদিন না হুড়মুড়িয়ে ভূমিসাৎ হয়। মেরামত তো হয় নাই দু-পুরুষ কাল।

—মেরামত? হুঁ, বিশাল বাড়ি মেরামত করা বড় সোজা? তা বলে এক্ষুণি পড়ে যাবে?

—আজ্ঞে যেতে পারে তো! আমি বলি কি কর্তা, এই মওকায় বেচে দিন। মোটা টাকা ঘরে আসবে। তারপর হিঃ হিঃ। পড়ুক হুড়মুড়িয়ে। আপনার কাঁচকলা।

জগদীশ রেগে বললেন,—তার মানে জেনে বুঝে লোকঠকানো!

—তো সে যদি বলেন তো একখানা ধম্মোপুণ্যির আখড়া খুঁজে দানই করে দ্যান।

—তাও তো ঠকানো। জানছি যখন পড়ে যাবে।

—বাঃ তাতে আর ঠকানোটা কোতা? তানারা তো গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনচেন না? তানাদের আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না। তাছাড়া অপনার পুণ্যির ছালাখানায় মোটা খানিকটা পুণ্যি জমা পড়বে। . . .যখন দানটা করবেন, খপরের কাগজের লোক আসবে। ফটাফট ফটক উঠবে।

জগদীশ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—বৈকুণ্ঠ, বললি তো ভালো। কিন্তু ওই দেড় মণ মহারানী মার্কা টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনি!

—ও আর চিন্তা করে লাভ নাই বড়কর্তা। ওসবও তো আপনার গাঁটের থেকে যাবে না? যাদের গেল তেনারা তো আগেই পগার পার হয়ে গেছেন।

—ঠিক। ঠিক। অ্যাঁ। তাইতো। বাঁচালিরে বৈকুণ্ঠ।

—তো এখন যাই বড়কর্তা। আবার আসতে অনুমতি করবেন তো? আপনার কাচে এলে বড় সুক পাই।

বড়কর্তা কিছু জবাব দেবার আগেই দরজায় টোকা।

ব্যস্। বড়কর্তা চাদর মুড়ি দিয়ে সপাট।

টোকা। টোকা থেকে ধাক্কা। ধাক্কা থেকে দুমদাম। দমাস-দমাস।

কিন্তু জগদীশ তো অঘোরে নিদ্রায়।

তবে ভয় খাবার কিছু নেই। নাক ডাকছে বাঘের গর্জনে।

সকাল বেলা ছেলে বলল,—বাবা, আপনাকে আর একা শুতে দেওয়া হবে না।

—কেন? কেন হে বাপু? আমার অপরাধ?

—আপনি রাতের বেলা সারারাত বিজবিজ করে কথা বলে চলেন। এটা একটা ব্যাধি।

—ব্যাধি! ওঃ! সারারাত বিজবিজ? বলি, নাক ডাকায়টা কে?

—সেটা শেষ রাতে। আপনার ঘরে আজ থেকে কেউ শোবে।

—কেউ শোবে না। আমি আজই প্রতাপপুরে যাচ্ছি।

—প্রতাপপুরে? একা?

—একা ছাড়া. . . তোমাদের সময় আছে? দ্যাখার অভাবে ওই বিশাল অট্টালিকাখানা ধ্বংস হতে বসেছে। ওটাকে আমি ওখানেই হরিসভায় দান করে আসবো।

ছেলে-বৌ দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলো।

—অ্যাঁ! দান করে আসবেন? এখন ওর দাম কত ভেবেছেন? আমি তো একটা খদ্দের ঠিক করার চেষ্টায় আছি।

জগদীশ মনে মনে বলেন, লবডঙ্কা। তোমার চেষ্টা সফল হবার আগেই বাড়ি মাটিতে শোবে।

মুখে বললেন,—না না। পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা হবে না। দানই করে দেবো।

—আর ওই ঠাকুরঘরের মেজেয় আর দেয়ালে পোঁতা খাঁটি রুপোর টাকাগুলো?

—পারিস তো উপড়ে নিয়ে আয়।

—সে তো আর সোজা কথা নয়।

—তাই তো বলছি, যেটা সোজা সেটাই হোক। দান করে দেয়া হোক। আমি আজই যাচ্ছি। একটা টিকিট আনিয়ে রাখি।

ছেলে রাগমাগ করে বলল,—একটা নয়, দুটো। আপনাকে তো আর এই বয়েসে একা ছাড়তে পারি না।

—তবে চল্। ভালোই হবে। ফটাফট ফটো ওঠবার সময় তোরও উঠে যাবে। কাগজে ছাপা হবে।

শুনে বৌ বলল,—আমিও যাবো।

—বেশ তো, চলো একবার শেষ-মেষ ভিটেবাড়ির দেশে।

যাওয়া হলো।

দিব্যি সমারোহ করেই যাওয়া হলো। ছেলে বৌ নাতি চাকর সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু?

কারোর ভাগ্যেই কি ফটো-ওঠা জুটল, কাগজে ছাপা হতে?

নাঃ, কপালে ঘি না থাকলে কি হবে?

সন্ধ্যেরাতে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয়ে পুরনো বাড়িতে না উঠে ওখানের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের বাড়িতে উঠলেন। ব্যস, সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি! ওঃ কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! যেন প্রলয়কাল ঘনিয়ে এসেছে। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঝড়ও।

জ্ঞাতিরা বলল,—দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড়বৃষ্টি দেখিনি। গাছ উপড়ে পড়ছে মড়মড়িয়ে, ঘরের চালাটালা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-দশ মাইল দূরে। দিঘি-পুকুরের জল উপচে উঠে লোকের বাড়িতে ঢুকে আসছে। কতজনের কত কী ঘটল।

আর?

আর সেই রাতেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনাটি। বৈকুণ্ঠর ঠাকুর্দা যার ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিল।

কিন্তু সকালবেলা দিব্যি আকাশ ফর্সা।

ঘুম টুম নেই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন জগদীশ।

দেখলেন সেই দেড় মণ রুপোর টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনির ওপর হাজার হাজার মণ ইঁট পাথর লোহা-লক্কড়ের স্তূপ।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন জগদীশ।

কানের গোড়ায় সহসা ফিসফিস।

—মন খারাপ করবেন না বড়কর্তা। ভবিষ্যৎকালে কোনো একদিন এই স্তূপ খনন হয়ে এইসব পুরাতন মুদ্রা . . .ইয়ে আবিষ্কার হবে।

—তুই? তুই এখানেও?

—আজ্ঞে আমাদের তো এখানেই বাস। তিন পুরুষ যাবৎ।

জগদীশ এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেউ কোথাও নেই।

—দিনের বেলাও ঘুরিস?

—আজ্ঞে আমার আবার দিন আর রাত। আমি তো সবসময়ই আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

—তা তোর ঠাকুর্দার দেখছি গণনায় ভুল। পুণ্যির ছালাটা ভরতে তো তর সইল না।

—না হোক গে। এমনিই আপনার অনেক আছে, পরের ধনে পোদ্দারি করে লাভটা কী? সে ভদ্দরলোক যা করে মঙ্গলের জন্যেই করে।

—সে 'ভদ্দরলোক'! মানে?

—কর্তা! আমার আবার ও নামটা মুকে আসে না। আপনি নিজে বুজে নিন।

BDeBooks.com

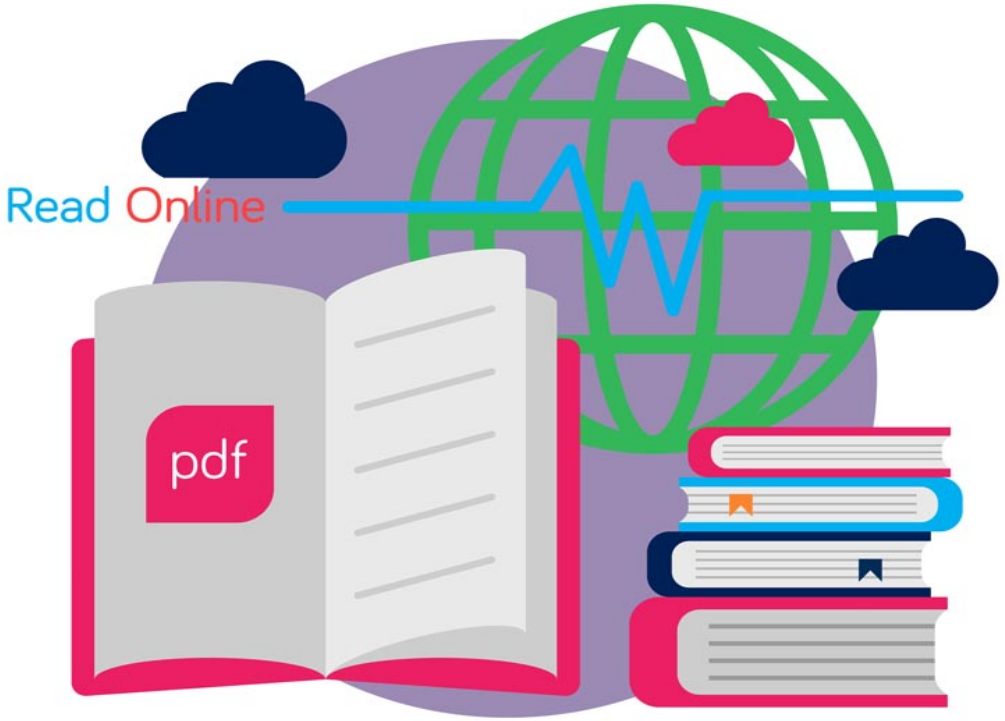

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com